

বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলনের ঘোষণাপত্র

প্রস্তাবনা

আমরা বিশ্বাস করি – জ্ঞান কোনো বিশেষ শ্রেণির সম্পত্তি নয়; তা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। যে সমাজে বই পৌঁছায় না, সেখানে প্রশ্নও পৌঁছায় না; আর যেখানে প্রশ্ন নেই, সেখানে মুক্তিও নেই। তাই আমরা অঙ্গীকার করছি – গ্রাম থেকে শহর, প্রতিটি জনপদে পাঠাগার গড়ে তুলব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, চিন্তার আশ্রয় ও মানুষের মিলনকেন্দ্র হিসেবে।

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এ দেশের মানুষ প্রমাণ করেছে যে জ্ঞান, ভাষা আর প্রশ্ন করার অধিকারই মুক্তির ভিত। একাত্তরে যারা এই জাতিকে দমাতে চেয়েছিল, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আঘাত হেনেছিল, বেছে বেছে হত্যা করেছিল শিক্ষক, লেখক আর চিন্তাবিদদের। সেই যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল “সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার”-এর; আর ১৯৭২ সালের সংবিধান ঘোষণা করেছিল, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ এ দেশের মানুষকে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা-ই হবে রাষ্ট্রের মূলনীতি। সেই প্রতিশ্রুতি আজও পূর্ণ হয়নি; সেই পথ বারবার রুদ্ধ হয়েছে। যতদিন এ দেশের একটি শিশুও বুঝে পড়তে না শেখে, ততদিন মুক্তির লড়াই শেষ হয়নি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই অসমাপ্ত মুক্তির লড়াই-ই এই আন্দোলন।

এই অঙ্গীকারের নির্যাস চার শব্দের একটি মূলমন্ত্রে, আর তার পূর্ণ ব্যাখ্যা ছয়টি মূলনীতিতে।

মূলমন্ত্র

পাঠ - প্রশ্ন - সাম্য - মুক্তি

পাঠ দিয়ে শুরু; পাঠ জাগায় প্রশ্ন; প্রশ্ন করার অধিকার সবার সমান; আর সবার সেই সাহসেই মানুষ ও সমাজের মুক্তি।

- **পাঠ** – জ্ঞানচর্চা, আজীবন শিক্ষা, আর নিজের জনপদের ইতিহাস, ভাষা ও ঐতিহ্য পড়া ও সংরক্ষণ করা (মূলনীতি ১ ও ৬)।
- **প্রশ্ন** – মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা, আর পাঠকের পড়ার স্বাধীনতা (মূলনীতি ৩ ও ৫)।
- **সাম্য** – জ্ঞানে সবার সমান অধিকার, আর ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ ও সক্ষমতা নির্বিশেষে মানুষের সমান মর্যাদা (মূলনীতি ৪ ও ২)।
- **মুক্তি** – মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দিয়েছে স্বাধীনতা; কিন্তু মুক্তি এখনো অসমাপ্ত। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বৈষম্য আর ভয় থেকে প্রতিটি মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তি – যা নিজের বিচারে ভাবতে ও প্রশ্ন করতে শেখায় – সেই অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেওয়াই এই আন্দোলনের লক্ষ্য (সব মূলনীতির লক্ষ্য)।

এখানে “সাম্য” ও “মুক্তি” কোনো দলীয় মতবাদের নাম নয়; এদের অর্থ এই ঘোষণাপত্রই নির্ধারণ

করে। মূলমন্ত্র ব্যানারে, স্লোগানে, লেটারহেডে ও মুখে মুখে ব্যবহারের জন্য; তার পূর্ণ অর্থ, অঙ্গীকার ও সীমারেখা নিচের ছয় মূলনীতি, “আমাদের সীমারেখা” ও কর্মসূচিতে বর্ণিত।

আমাদের ঐতিহাসিক অঙ্গীকার

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তিন প্রতিশ্রুতি – সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার – আমাদের গন্তব্য। ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতি সেই গন্তব্যের পথে জাতির প্রথম পথনকশা। বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলন এই আদর্শগুলো ধারণ করে নিজের কাজের পরিসরে, এই অর্থে:

- জাতীয়তাবাদ – ধর্ম নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়া পরিচয়; যেখানে বাংলার পাশাপাশি এ দেশের প্রতিটি জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতি সমান মর্যাদা পায়।
- সমাজতন্ত্র – মানুষের ওপর মানুষের শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা; জ্ঞান গণসম্পদ, কেনাবেচার পণ্য নয়।
- গণতন্ত্র – মত প্রকাশ, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহির অধিকার; প্রতিটি পাঠাগার নিজেই হবে গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্র।
- ধর্মনিরপেক্ষতা – সব ধর্মের সমান মর্যাদা, কোনো ধর্মের মানুষের প্রতি বৈষম্য নয়, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহারের বিরোধিতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।

এই আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য নয়। যে দল, গোষ্ঠী বা কর্তৃপক্ষই এই আদর্শ থেকে সরে যাক, আমাদের অবস্থান একই থাকবে।

আন্দোলনের অংশীদার

পাঠক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, লেখক, অভিভাবক, সাংস্কৃতিক কর্মী – জ্ঞানের আলো ছড়াতে চান এমন যে-কেউ এই আন্দোলনের অংশীদার। অংশীদার হওয়ার মূল শর্ত একটাই: এই ঘোষণাপত্রের মূলনীতির প্রতি অঙ্গীকার। “অংশীদার” আন্দোলনের বৃহত্তর বৃত্ত; আনুষ্ঠানিক সদস্যপদের যোগ্যতা, চাঁদা ও পদ্ধতি নির্ধারিত হবে আন্দোলনের গঠনতন্ত্রে (ধারা-৭ ও ৮), আর সেই অঙ্গীকার রক্ষার পদ্ধতিও সেখানেই বর্ণিত। আর একটাই সীমারেখা: কোনো রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, অর্থদাতা বা কর্তৃপক্ষ – সরকারি হোক বা বেসরকারি – কোনো পাঠাগারের সংগ্রহ, নেতৃত্ব বা কার্যক্রম এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

ছয় মূলনীতি

১. জ্ঞানচর্চা ও আজীবন শিক্ষার প্রসার

আমরা ঘোষণা করছি – শিক্ষা কোনো বয়সে শেষ হয় না, কোনো সনদে সীমাবদ্ধ থাকে না। পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং জীবনব্যাপী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করাই আমাদের প্রথম ব্রত।

ব্যাখ্যা: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেখানে থেমে যায়, পাঠাগার সেখান থেকে শুরু হয় – শ্রেণিকক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী

হিসেবে নয়, পরিপূরক হিসেবে (কর্মসূচি চ)। শিশু থেকে বৃদ্ধ – প্রত্যেকের হাতে বই তুলে দেওয়া, নিয়মিত পাঠচক্র চালানো, পড়াকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করা। আমরা চাই, প্রতিটি পাঠাগার হয়ে উঠুক এমন এক বিদ্যালয় – যার কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেই, কোনো বেতন নেই, কোনো শেষ ক্লাস নেই।

২. নৈতিকতা, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

আমরা ঘোষণা করছি – জ্ঞান যদি মানুষকে মানবিক না করে, তবে তা অসম্পূর্ণ। সততা, সহমর্মিতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবকল্যাণের মূল্যবোধ আমরা কেবল কথায় নয়, কাজে প্রতিষ্ঠা করব।

ব্যাখ্যা: পাঠচক্র ও বিতর্কে নৈতিক প্রশ্নে ভাবতে শেখা, দুর্বোধ্য-সংকটে সমাজসেবায় নামা, আর ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাইকে এক টেবিলে বসানো – এই তিন পথে মূল্যবোধের চর্চা হবে। কোনো নির্দিষ্ট মত চাপিয়ে দেওয়া পাঠাগারের কাজ নয়; তার কাজ মানুষকে নিজের বিবেক দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া। যে পাঠাগারে সব ধর্মের, সব মতের মানুষ পাশাপাশি বসে পড়ে, সেই পাঠাগার নিজেই অসাম্প্রদায়িকতার জীবন্ত পাঠ।

৩. মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ

আমরা ঘোষণা করছি – আমরা কেবল উত্তর মুখস্থ করা পাঠক চাই না; আমরা চাই প্রশ্ন করতে জানা মানুষ। যুক্তিবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে আমরা উৎসাহিত করব।

ব্যাখ্যা: প্রযুক্তি ব্যবহার করা আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতি ধারণ করা এক কথা নয়। আমাদের পাঠাগার হবে প্রশ্ন করতে শেখার জায়গা – যেখানে বিজ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক সভা, সাহিত্য আসর, গবেষণা ও শিল্পচর্চা একসঙ্গে চলবে। কোনো প্রশ্নই এখানে নিষিদ্ধ নয়; কোনো কৌতূহলই এখানে অপরাধ নয়। যুক্তি ও প্রমাণের কষ্টিপাথরে সবকিছু যাচাই করার সাহসই এই আন্দোলনের প্রাণ।

৪. সবার জন্য পাঠাগার ও জ্ঞানপ্রাপ্তির সমান সুযোগ

আমরা ঘোষণা করছি – জ্ঞানের দরজায় কোনো দারোয়ান থাকবে না। গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্র, লিঙ্গপরিচয় ও শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছে পাঠাগার ও তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া আমাদের অঙ্গীকার।

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে পাঠাগার-সুবিধা আজও মূলত শহরকেন্দ্রিক; আমরা এই বৈষম্য ভাঙব – গ্রামে গ্রামে পাঠাগার, ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্বারে বই। নারী ও কিশোরীদের নিরাপদ পাঠপরিবেশ, ভিন্নভাবে সক্ষম পাঠকের উপযোগী ব্যবস্থা, নিরক্ষর মানুষের জন্য পাঠ-সহায়তা – সমান সুযোগ মানে সবার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা।

৫. পাঠকের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অবাধ অধিকার

আমরা ঘোষণা করছি – কী পড়া যাবে আর কী পড়া যাবে না, তা ঠিক করার অধিকার পাঠকের নিজের। আমরা পাঠকের পড়ার স্বাধীনতা রক্ষা করব এবং জ্ঞানের ওপর যেকোনো অবরোধের বিরুদ্ধে

দাঁড়াব।

ব্যাখ্যা: ইতিহাস সাক্ষী – যারা বই ভয় পায়, তারা মানুষের জাগরণকে ভয় পায়। কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত চাপে আমরা তাক থেকে বই সরাব না, লেখকের কণ্ঠ রোধ করব না, পাঠকের কৌতূহলকে অপরাধ গণ্য করব না। ভিন্নমত পড়া মানে ভিন্নমতে দীক্ষিত হওয়া নয় – নিজের মতকে যাচাই করার সুযোগ। পাঠকের স্বাধীনতার আরেক নাম পাঠকের গোপনীয়তা: কে কী পড়ছে, কী খুঁজছে – তার নথি পাঠাগার রাখবে সর্বনিম্ন, কারণ যে নথি রাখাই হয় না, তা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। নজরদারির ভয় যেখানে, মুক্ত পাঠ সেখানে নেই।

৬. স্থানীয় জ্ঞান, ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ

আমরা ঘোষণা করছি – পাঠাগার কেবল জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নয়; জ্ঞান সৃষ্টি ও সংরক্ষণেরও কেন্দ্র। প্রতিটি জনপদের নিজস্ব ইতিহাস, ভাষা, লোকসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমরা সংগ্রহ করব, সংরক্ষণ করব, নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেব।

ব্যাখ্যা: গ্রামের পাঠাগার শুধু শহর থেকে আসা বইয়ের গুদাম হবে না – সে হবে নিজের অঞ্চলের স্মৃতিভাণ্ডার। স্থানীয় ইতিহাস লিখে রাখা, প্রবীণদের মুখের গল্প-গান-প্রবাদ সংগ্রহ করা, আঞ্চলিক ভাষা ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা-সাহিত্য নথিভুক্ত করা – সম্মান ও সম্মতির ভিত্তিতে, তথ্যদাতার নাম-স্বীকৃতিসহ। যে জাতি নিজের শিকড় চেনে না, সে অন্যের জ্ঞানও ধারণ করতে পারে না। প্রতিটি জনপদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস – মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতি – সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এই মূলনীতির বিশেষ অগ্রাধিকার, কারণ সেই প্রজন্ম দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সীমারেখা

স্বাধীনতার এই ঘোষণাগুলো যেন কখনো তার উল্টো অর্থে ব্যবহৃত না হয়, সে জন্য চারটি সীমারেখা আমরা শুরুতেই টেনে রাখছি:

এক – মতের বহুত্ব সুরক্ষিত; কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর মর্যাদা অস্বীকারকারী বিদ্বেষ ও বৈষম্য কখনো “একটি মত” হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবে না।

দুই – প্রশ্নের অধিকার অবাধ; কিন্তু প্রশ্নের নামে হয়রানি বা হেনস্তা প্রশ্ন নয় – জানার আকাঙ্ক্ষা আর আঘাতের অভিপ্রায় এক জিনিস নয়।

তিন – নির্বাচন আর অপসারণ এক নয়। কোন বই সংগ্রহে ঢুকবে তা নির্ধারণ করবে প্রকাশ্য সংগ্রহনীতি; কিন্তু একবার সংগ্রহে ঢোকা কোনো বই মতাদর্শিক চাপে সরানো হবে না। জীর্ণ বই বদলানো বা পুরোনো সংস্করণ হালনাগাদ করা সংগ্রহ-ব্যবস্থাপনা, সেলরশিপ নয়।

চার – শিশুর সুরক্ষা সেলরশিপ নয়। বয়স-উপযোগী পাঠপরিবেশ জ্ঞানের দরজায় দারোয়ানি নয় – শিশুকে নিরাপদে সেই দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। একইভাবে, সম্মতি ছাড়া কারও জ্ঞান বা স্মৃতি সংগ্রহ করা সংরক্ষণ নয় – সংরক্ষণ যেন কখনো আত্মসাতে পরিণত না হয়।

কর্মসূচিমূলক অঙ্গীকার

মূলনীতির চেতনা সাধারণ প্রক্রিয়ায় অপরিবর্তনীয় – কোনো চাপ বা কর্তৃত্ব তা বদলাতে পারবে না; কেবল গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত বিশেষ প্রক্রিয়ায়, সদস্যদের সর্বসদস্য ভোটে সুস্পষ্ট সম্মতিতে, তা পরিবর্তনযোগ্য; তবে তার ভাষা ও ব্যাখ্যা অভিজ্ঞতার আলোকে পরিমার্জিত হতে পারে, আর কর্মসূচি সময়ের প্রয়োজনে সম্প্রসারিত ও হালনাগাদ হবে।

ক. ডিজিটাল প্রবেশাধিকার ও তথ্যসাক্ষরতা

একুশ শতকের পাঠাগারে ছাপা বইয়ের পাশাপাশি থাকবে ই-বই, ইন্টারনেট সুবিধা ও ডিজিটাল শিক্ষা-উপকরণ। তার চেয়েও জরুরি – গুজব, অপতথ্য ও ভুয়া খবর চেনার দক্ষতা গড়ে তোলা। তথ্যের এই বিশাল স্রোতে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা – তা যাচাই করতে শেখানো এ যুগের পাঠাগারের অন্যতম দায়িত্ব। প্রতিটি পাঠাগারে তথ্যসাক্ষরতা কর্মশালা হবে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ।

খ. সামাজিক মিলনকেন্দ্র হিসেবে পাঠাগার

পাঠাগার হবে ঘর ও কর্মস্থলের বাইরে মানুষের “তৃতীয় ঠিকানা” – যেখানে আলোচনা সভা, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞানমেলা ও প্রদর্শনী নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে। বই মানুষকে ডাকে, কিন্তু মানুষই মানুষকে ধরে রাখে। প্রাণবন্ত সামাজিক পরিসর ছাড়া কোনো পাঠাগার দীর্ঘজীবী হয় না।

গ. গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পরিচালনা

প্রতিটি পাঠাগার পরিচালিত হবে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে – বিশেষত তরুণ ও নারীদের নেতৃত্বে। পরিচালনা কমিটি হবে নির্বাচিত ও জবাবদিহিমূলক; আয়-ব্যয়ের হিসাব হবে উন্মুক্ত। মালিকানার বোধই টেকসই পাঠাগারের ভিত্তি – মানুষ যাকে “আমাদের পাঠাগার” বলে, তাকেই রক্ষা করে।

ঘ. স্থায়িত্ব ও স্বাবলম্বিতা

প্রতিটি পাঠাগার অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে; অর্থায়ন হবে বহুমুখী, স্বচ্ছ ও শর্তমুক্ত – স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাঁদা, শুভানুধ্যায়ীদের অনুদান, সামাজিক অংশীদারিত্ব ও নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে। সরকারি বা বেসরকারি সহায়তা গ্রহণযোগ্য, যদি এবং কেবল যদি তা শর্তমুক্ত হয়। কোনো একক উৎসের ওপর আমরা নির্ভরশীল হব না – গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকেই অর্থ গ্রহণ করব; কারণ যে হাত অর্থ জোগায়, সে হাত একদিন বইয়ের তাকও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। অর্থায়নের স্বাধীনতাই পাঠকের স্বাধীনতার প্রথম রক্ষাকবচ।

ঙ. শিশু ও কিশোর সুরক্ষা

পাঠাগারের প্রধান সেবাগ্রহীতা শিশু-কিশোর; তাদের জন্য পাঠাগার হবে নিরাপদ আশ্রয়। শিশুদের সঙ্গে কাজের স্পষ্ট আচরণবিধি, বয়স-উপযোগী পাঠপরিবেশ, এবং যেকোনো নিপীড়ন বা অসদাচরণের অভিযোগে দ্রুত ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থা – এই তিনটি হবে প্রতিটি পাঠাগারের বাধ্যতামূলক মান। পাঠাগারকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবেন।

চ. শিক্ষার্থীর সহায় পাঠাগার

পাঠাগার পাঠ্যবই পড়ানোর আরেকটি শ্রেণিকক্ষ নয়, কোচিংয়ের বিকল্প দোকানও নয়; সে শিক্ষার্থীকে নিজে পড়ে বুঝতে শেখায়, যাতে কারও কাছে উত্তর কিনতে না হয়। নিরিবিলি পড়ার ঘর, অভিধান ও সহায়ক বই, যে শিশু এখনো সাবলীলভাবে পড়তে পারে না তার জন্য পাঠ-সহায়তা, আর বিনা পয়সার সহপাঠী পাঠচক্র – এই চার পথে আমরা কোচিংয়ের ওপর নির্ভরতা কমাতে চাই। গাইড বই, সাজেশন বা মডেল টেস্ট পাঠাগারের কাজ নয়। বাইরে শিক্ষা যত প্রতিযোগিতার হোক, পাঠাগারে কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয় – এখানে শেখা হয় পাশের জনকে সঙ্গে নিয়ে। তাই আমরা কোনো শিক্ষার্থীর মেধাতালিকা বা পড়ার র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করব না।

সমাপনী

এই ঘোষণাপত্র কোনো শেষ কথা নয় – এ এক চলমান অঙ্গীকারের শুরু। আমরা জানি, একটি পাঠাগার একটি জনপদের চেহারা বদলে দিতে পারে; আর হাজারো পাঠাগার বদলে দিতে পারে একটি জাতির ভাগ্য। বইয়ের পাতায় পাতায় যে আলো ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তোলাই আমাদের আন্দোলন।

জ্ঞান হোক সবার – পাঠাগার হোক প্রতিটি জনপদে।

গ্রহণ

এই ঘোষণাপত্র _____ তারিখে _____ স্থানে অনুষ্ঠিত সভায়
পঠিত ও গৃহীত হলো। আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীরা, এর মূলনীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার প্রতিশ্রুতি
দিচ্ছি।

নাম পরিচয় স্বাক্ষর _____